নিবন্ধ

বুদ্ধ পূর্ণিমা

নিবিড় চৌধুরী

গৌতম বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি ও মহানির্বাণ লাভের জন্য বৈশাখী পূর্ণিমা বৌদ্ধদের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ।

বৌদ্ধদের কাছে অষ্টমী, অমবস্যা ও পূর্ণিমা–এই তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আড়াই হাজারেরও বেশি সময় আগে এক আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে রাজকুমার সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ যুগে যুগে কবি-শিল্পী-ভবঘুরেদের অনুপ্রেরণা দিয়ে আসছে। অনেক কিছু থাকার মাঝেও মানুষ যে নিঃসঙ্গ-অসহায়–সিদ্ধার্থের উদাহরণ ও তুলনা দিয়ে যেন বারবার গৃহত্যাগের কথায় বলে আসছেন কবি-শিল্পীরা। কবি জীবনানন্দ দাশ কী বলেননি? 'বধূ শুয়েছিল পাশে–শিশুটিও ছিল;/প্রেম ছিল, আশা ছিল–জ্যোস্নায়-তবু সে দেখিল/কোন ভূত? ঘুম কেন ভেঙে গেল তার?' জীবনানন্দ গবেষক ও পাঠকেরা বলে থাকেন, এই 'আট বছর আগের একদিন' কবিতাটি কবি লিখেছিলেন সিদ্ধার্থের জীবনের ঘটনায় প্রভাবিত হয়ে। নিজেও যে বড্ড একা ছিলেন জীবনানন্দ! সে তো আমরা তার উপন্যাস 'মাল্যবান' পড়ে জানি। হুমায়ুন আহমেদ 'গৃহত্যাগী জোছনা'য় লিখেছেন, 'প্রতি পূর্ণিমার মধ্যরাতে একবার/আকাশের দিকে তাকাই।/গৃহত্যাগী হবার মতো জোছনা কি উঠেছে?...আমি সিদ্ধার্থের মতো/গৃহত্যাগী জোছনার জন্য বসে আছি/যে জোছনা দেখা মাত্র সমস্ত/দরজা খুলে যাবে।/ঘরের ভেতর/ঢুকে পড়বে বিস্তৃত প্রান্তর।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনানন্দ দাশ থেকে হুমায়ুন আহমেদ–বাংলা সাহিত্যের এই মহারথীরা কেন সিদ্ধার্থের জীবনচিত্র দ্বারা এতো প্রভাবিত ছিলেন? বুদ্ধের অহিংস ধর্ম তো ছিলোই। তবে সবচেয়ে প্রভাব রেখেছে, রাজকুমার হওয়া সত্ত্বেও সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে জ্ঞান ও মুক্তির সন্ধানে এক পূর্ণিমায় বেরিয়ে পড়াকে।

সেদিন ছিল আষাঢ়ী পূর্ণিমা। চারদিকে থৈ-থৈ ফুটে আছে জ্যোৎস্নার ফুল। রাজকুমার সিদ্ধার্থকে গৃহত্যাগী হওয়ার মন্ত্রণা দিতেই হয়তো এমন স্বর্গীয় দৃশ্য রচিত হয়েছিল সেই রাতে। অনেক আগে থেকেই যে তিনি সংকল্প করে রেখেছিলেন, রাজকার্য, বধূ-সন্তান, রাজ্য ছেড়ে বেরিয়ে পড়বেন মুক্তির সন্ধানে। এর আগে নগর প্রদক্ষিণে বেরিয়ে ভিন্ন ভিন্ন চার দিনে দেখেছিলেন মানবজীবনের দুঃখের চারটি রূপ। দুঃখ, জরা ব্যাধি, মৃত্যু–এসব দেখেই ছোটবেলা থেকে ধর্মপ্রাণ-অহিংস সিদ্ধার্থ গৌতমের মনে মুক্তির ইচ্ছা জাগে। আষাঢ়ী পূর্ণিমা রাতে শুয়ে থাকা ছেলে শিশু রাহুল ও পাশের বধূ যশোধরাকে এক পলক দেখে রথচালক ছন্দককে ডেকে তুলে চললেন বনবাসে। অনেক যাত্রা শেষে নিরঞ্জনা নদীর সামনে পৌঁছে থামল তাঁদের ঘোড়ায় বাঁধা রথ। সিদ্ধার্থ নেমে এসে তলোয়ার হাতে নিজের লম্বা চুল কেটে ও রাজপোশাকের সমস্ত কিছু ছন্দকের হাতে তুলে দিয়ে ধ্যানের উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসীর গেরুয়া পোশাক ধারন করলেন। তারপর ছন্দককে বিদায় দিলেন। রথের সারথি সিদ্ধার্থের শেষ চিহ্নটুকু নিয়ে ফিরে চললেন কাঁদতে কাঁদতে। পরদিন তাঁর মুখে রাজকুমারের গৃহত্যাগের খবর শুনে কান্নার ঢল নামল রাজ্যে। শাক্যবংশের রাজা সিদ্ধার্থের পিতা শুদ্ধোধন একমাত্র পুত্রের গৃহ বিদায়ের শোকে মূহ্যমান হলেন। পালক মাতা গৌতমীর চোখে ঢল নামল। কাঁদতে কাঁদতে মূর্ছা গেলেন স্ত্রী যশোধরা।

বুদ্ধত্ব লাভের উদ্দেশ্যে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করেছিলেন বিধায় বৌদ্ধ ধর্মালম্বীদের কাছে এই পূর্ণিমা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তবে গৌতম বুদ্ধের অনুসারীদের কাছে সবচেয়ে পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ হলো বৈশাখী পূর্ণিমা। আড়াই হাজার বছর আগে কপিলাবস্তুতে (বর্তমানে নেপালের অংশ) জন্মগ্রহণসহ আজকের সময়ে ভারতের বুদ্ধগয়া নামে পরিচিত স্থানের বোধিতরু মূলে ৬ বছর টানা কঠোর ধ্যান সাধনা করে গৌতমের বুদ্ধত্ব ও কুশীনগরে (বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশ) মহাপরিনির্বাণ লাভ–এই তিন অর্থ ও স্মৃতিবহ ঘটনা হয়েছিল বৈশাখী পূর্ণিমায়। যে কারণে এ পূর্ণিমা বুদ্ধ পূর্ণিমা নামেও পরিচিত। বৌদ্ধদের এই পবিত্র ধর্মীয় দিন এ বছর পালিত হবে ২৩ মে (সরকারি হিসাবে)। তবে স্থানিক ও পূর্ণিমা বিবেচনায় কিছু কিছু স্থানে তারতম্য হতে পারে। তবে সবাই মানবমুক্তির পথপ্রদর্শক বুদ্ধকে পূজা ও বন্দনা করার উদ্দেশ্যেই দিনটি পালন ও উদ্‌যাপন করবেন।

অবশ্য উৎসবের দিন হলেও এদিন বৌদ্ধরা সবচেয়ে পবিত্র ও শান্ত দিন পালন করেন। সকালে মন্দিরে বা কিয়াংয়ে বুদ্ধ পূজা দিয়ে দিন শুরু হয়। এরপর বৌদ্ধভিক্ষুদের কাছে সবাই সমবেত হয়ে বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘকে পূজা ও বন্দনা করার পাশাপাশি উপোসথ থাকার উদ্দেশ্যে অষ্টশীল গ্রহণ করেন। বিকেলে সবাই সংঘের কাছে ধর্মকথা শুনতে বিহার প্রাঙ্গণে জড়ো হোন। দান-দক্ষিণা দেওয়ার পাশাপাশি কেউ কেউ মোমবাতি,

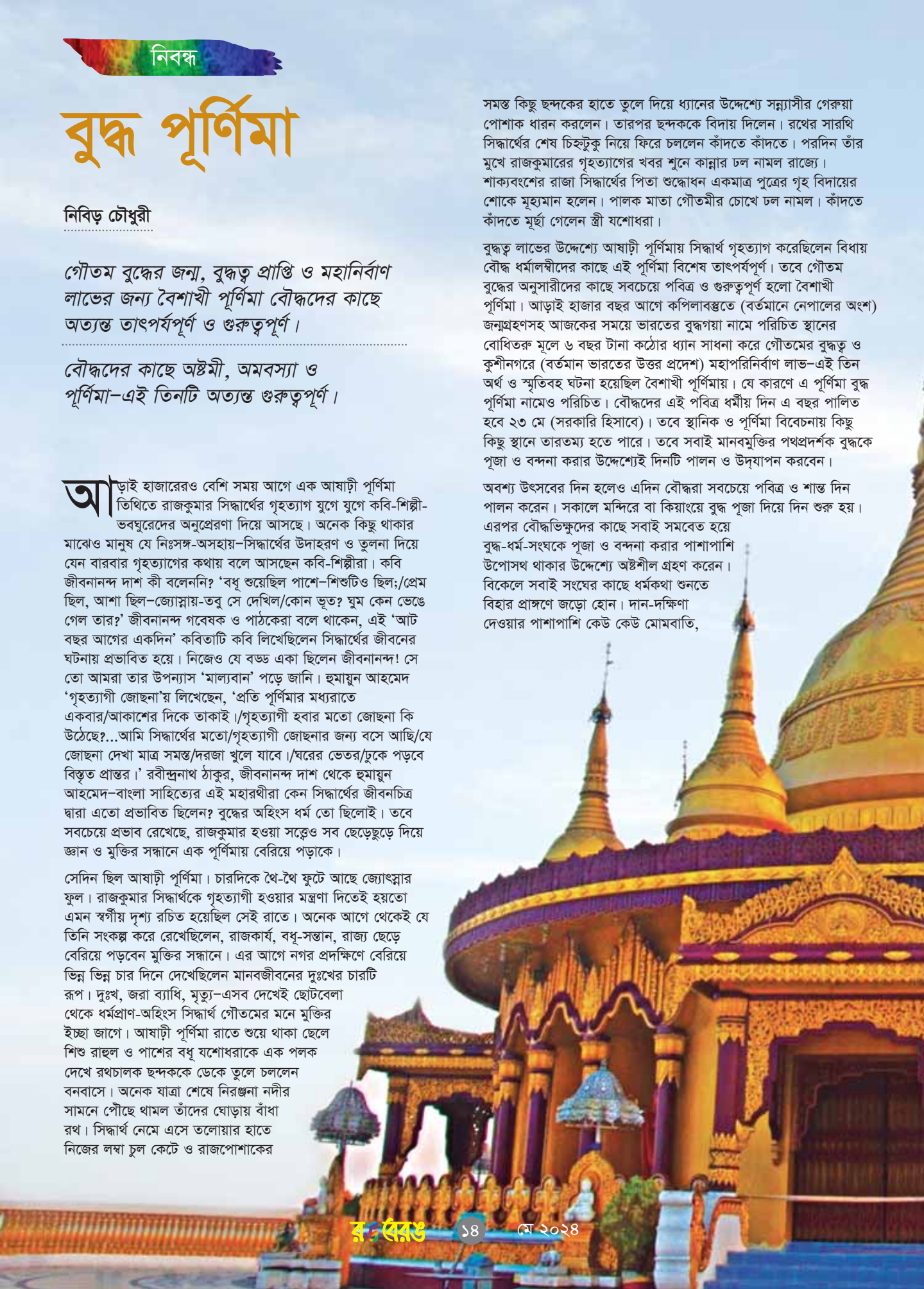

আগরবাতি ও ফুল দিয়ে বুদ্ধকে পূজা ও সম্মান জানান। বুদ্ধের প্রতীকি হিসেবে পূজা দেওয়া হয় বুদ্ধ মূর্তিকে। সন্ধ্যায় হাজার তেল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হয়। এভাবেই কাটে বৌদ্ধদের বুদ্ধ পূর্ণিমা। সেদিন বিহারে বিহারে মানুষের ঢল নামে। এক গ্রামের মানুষ আরেক গ্রামের বিহারে ঘুরে ঘুরে বুদ্ধকে বন্দনা করেন। প্রণাম জানান। দেখা-সাক্ষাৎ হয় পরিচিতদের মধ্যে।

বৌদ্ধদের কাছে অষ্টমী, অমবস্যা ও পূর্ণিমা–এই তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে পূর্ণিমা। কোনো না কোনো পূর্ণিমার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বুদ্ধের স্মৃতি। আষাঢ়ী পূর্ণিমা, আশ্বিনী পূর্ণিমা, বৈশাখী পূর্ণিমা, ভাদ্র পূর্ণিমা মাঘী পূর্ণিমা–বৌদ্ধ জীবনের সঙ্গে এসব পূর্ণিমা বিশেষ তাৎপর্য্যবহ। তবে এ সবকিছুর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো বৈশাখী বা বুদ্ধ পূর্ণিমা। কারণ সিদ্ধার্থ চাইলে রাজ্যভার পেতে পারতেন। এমনকি পুরো পৃথিবীর শাসনভার পাওয়ারও ক্ষমতা ছিল।

সেবাদাসীদের নিয়ে পিতৃবাড়িতে যাওয়ার সময় কপিলাবস্তু নামক স্থানে এলে বৈশাখী পূর্ণিমার রাতে গর্ভব্যথা উঠে রানী মহামায়ার। সেই রাতে পৃথিবী আলোকিত করে জন্ম নেন সিদ্ধার্থ। জন্মের পরপরই সাত কদম হেঁটে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেন তিনি। তাঁর সেই সাত কদমে ফুটে সাতটি পদ্মফুল। সিদ্ধার্থের বয়স যখন সাত, মাতৃহারা হোন তিনি। তাঁকে লালন পালন করেন মহামায়ার বোন গৌতমী। মাসির কোলে লালিত হয়েছিলেন বলে পরবর্তীতে গৌতম বুদ্ধ নামে সিদ্ধার্থ পরিচিতি পান। ছোটবেলা থেকে ভাবুক ও ধার্মিক শাক্য রাজবংশের রাজকুমার মানবজীবনের দুঃখ কষ্ট মৃত্যু দেখে এর থেকে মুক্তির সাধনায় আষাঢ়ী পূর্ণিমা রাতে গৃহত্যাগ করেন মাত্র ২৯ বছর বয়সে।

এরপর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ঋষি মনীষির কাছে জ্ঞানার্জনের জন্য গমন করেন। কিন্তু শিক্ষা তাঁর পছন্দ হচ্ছিল না। কেউ তাঁকে মুক্তির পথ দেখাতে পারছিলেন না। এরপর নিজেই সিদ্ধান্ত নেন নিজেকে আলোকিত করার। ধ্যানে বসলেন বোধি তরুমূলে। সেই ধ্যানে টানা কেটে গেল ৬ বছর। জীর্ণ শীর্ণ হয়ে গেল দেহ। কিন্তু সিদ্ধার্থ ধ্যান ভাঙলেন না। এত লম্বা সময় ধ্যানের পরও সিদ্ধার্থেও বোধি (জ্ঞান) লাভ হলো না। ধ্যান ভেঙে যখন ভাবছেন মুক্তির কথা ওই সময় সুজাতা নাম্নী এক ধর্মপ্রাণ সিদ্ধার্থকে এভাবে ধ্যানে বসে থাকতে দেখে শ্রদ্ধায় পায়েস দান করেন। সেই পায়েস খেয়ে সিদ্ধার্থ সংকল্প করেন, এবারের ধ্যানে বুদ্ধত্ব লাভ করবেন। সেটিই হয়। পুনরায় ধ্যানে বসে মাত্র ৩৯ দিনের মধ্যে বোধিজ্ঞান লাভ করেন গৌতম। এ সময় মারেরা তাঁর ধ্যান ভাঙাতে কম চেষ্টা করেননি। আকাশে বজ্র চমকেছে, বন্যায় ডুবে গেছে সব, রোদে পুড়ে গেছে গাছপালা। তবু ধ্যান ভাঙেননি। বুদ্ধত্ব লাভের পর সাতদিন পৃথিবীকে অবলোকন করেন তিনি। পৃথিবীতে তখন সুবাতাস ও সুন্দর সময় বয়ে যাচ্ছে। পৃথিবী যে একজন বুদ্ধ পেল! হাজার হাজার পরই যে একজন বুদ্ধ আসেন। গৌতম বুদ্ধত্বের অঙ্কুর বীজ বপন করেছিলেন, অনেক অনেক হাজার বছর পূর্বে, দীপঙ্কর বুদ্ধের সময়ে।

৩৬ বছর বয়সে বুদ্ধত্ব লাভ করেন গৌতম। আবিষ্কার করেন স্বর্গ-ব্রহ্মস্থানের ওপরেও আরেকটি জায়গা আছে–নির্বাণ। যার অর্থ 'নির্বাপিত হওয়া'। যেখানে পৌঁছালে জন্মান্তর চক্রে পড়তে হবে না। মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণী হয়ে ভোগ করতে হবে না দুঃখবোধ। নির্বাণ প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি প্রাণ জন্মান্তর চক্রে ঘুরতে থাকবে। কর্মফল অনুযায়ী মৃত্যুর পর কেউ নরকে, কেউ স্বর্গে, কেউ সাপ, কেউ কুকুর, কেউ মানুষ হয়ে জন্ম নিতেই থাকবে। যতদিন না একের পর এক পারমী পূরণ করে নির্বাণ লাভ না হয়। বুদ্ধ মানে জ্ঞান। বুদ্ধ চাইলে আপনিও হতে পারবেন। তবে তার জন্য পূরণ করতে হবে পারমী, করতে হবে দান, শীল, ধ্যান পারমী। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির আগে ৫৪৯ পর্যন্ত তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন বিভিন্ন সত্ত্ব হিসেবে। কখনো মানুষ, কখনো সাপ, কখনো পাখি–প্রতি জন্মেই পূরণ করেছেন পুণ্য ও পারমী সঞ্চয়। সেই কারণেই তিনি মানবশ্রেষ্ঠ। বুদ্ধের মূর্তিকে পূজা দেওয়া মানে তাঁর স্মৃতি ও দেখানো মুক্তির পথকে শ্রদ্ধা জানানো। আজও যেমন লেনিন, রবীন্দ্রনাথের ছবি বা মূর্তিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁদের ভক্তরা সম্মান জানায়, তদ্রুপ।

বুদ্ধ চাইলে কখনো মৃত্যুবরণ না করেই থাকতে পারতেন। কিন্তু তিনি যে মানুষ, মানুষ হয়েই অসাধ্য সাধনের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করেছেন। তবে প্রতিটি প্রাণকেই যে একদিন না একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে সেটি বুঝানোর জন্যই এক মাঘী পূর্ণিমায় শিষ্যদের মহাপরিনির্বাণ লাভ বা আয়ু বিসর্জনের ঘোষণা দেন। মহাপুরুষেরা কখনো অনর্থ কথা বলেন না এবং তাঁদের কথা কখনো নড়চড় হয় না। আরেক বৈশাখী পূর্ণিমায় ৮০ বছর বয়সে কুশীনগরে শিষ্য পরিবেষ্টিত অবস্থায় সিংহশয্যায় শায়িত হয়ে মানুষের স্বাভাবিক মৃত্যুই বরণ করেন গৌতম বুদ্ধ। বৌদ্ধদের কাছে যা বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ নামে পরিচিত। যার কারণে গৌতম বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি ও মহানির্বাণ লাভের জন্য বৈশাখী পূর্ণিমা বৌদ্ধদের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ। এদিন বৌদ্ধরা বুদ্ধের স্মৃতি স্মরণ করে মৈত্রীময় চিত্তে জগতের সকল প্রাণীর দুঃখ হতে মুক্তির চেতনায় দিনটি পালন করেন। বুদ্ধ যে বলেছিলেন, 'সব্বে সত্তা সুখিতা ভবন্তু'। 'জগতের সকল প্রাণী সুখি হোক'।